স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

অগ্রহায়ণ ১৪২৪ | ডিসেম্বর ২০১৭ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ২

@icddr_b icddrb company/icddrb www.icddrb.org

গর্ভবতী মায়ের জন্ডিস

ডাঃ শেষানুজ চৌধুরী, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল

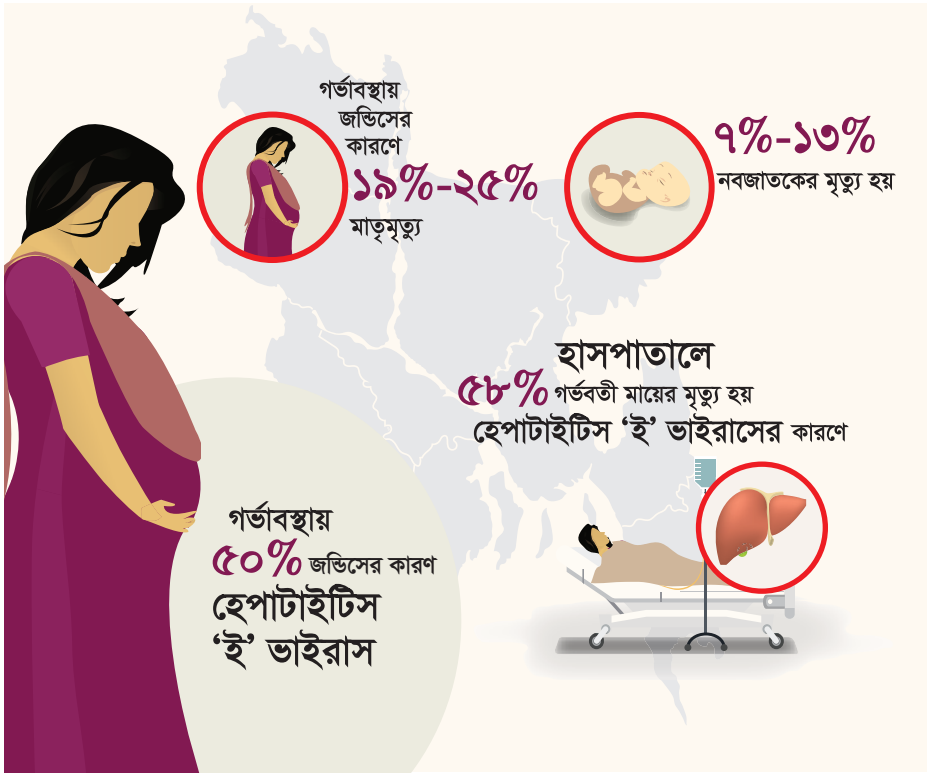

জন্ডিস রোগটি আমাদের সকলের নিকট অতি পরিচিত। জন্ডিস যকৃতের (লিভার) একটি রোগ। যেকোনো বয়সের মানুষ এ-রোগে আক্রান্ত হতে পারে। জন্ডিস সবসময়ই যে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা কিন্তু নয়, তবে গর্ভাবস্থায়, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার তৃতীয় ধাপে (২৯-৪০ সপ্তাহ) এটি ভয়ের কারণ হতে পারে। তাই সঠিক সময়ে জন্ডিস নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা না হলে পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ—এতে মা ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু হতে পারে। গর্ভাবস্থায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, যা ভাইরাসের বংশ বিস্তারের জন্য সহায়ক সময়, বিশেষ করে হেপাটাইটিস 'ই' ভাইরাসের। গর্ভাবস্থায় যত জন্ডিস হয় তার শতকরা ৫০%-এর কারণ হেপাটাইটিস 'ই' ভাইরাস। বাংলাদেশে মা ও নবাগত শিশুমৃত্যুর ওপর আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানী এমিলি গারলি ও তাঁর সহকর্মীগণ রচিত এক নিবন্ধে (২০১২ সালের নভেম্বরে *আমেরিকান জার্নাল অব পাবলিক হেলথ*-এ প্রকাশিত) দেখা যায়, বাংলাদেশে যেসব কারণে মাতৃমৃত্যু হয় তার ১৯%-২৫%-ই হয় গর্ভাবস্থায় জন্ডিসের কারণে এবং ৭%-১৩% নবজাতকের মৃত্যুও হয় একই কারণে। এছাড়া, হাসপাতালে ৫৮% গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু হয় হেপাটাইটিস 'ই' ভাইরাসের সংক্রমণজনিত যকৃতের মারাত্মক অসুখে। ভারতে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে গর্ভাবস্থার তৃতীয় ধাপে (২৯-৪০ সপ্তাহ) হেপাটাইটিস 'ই' ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুর হার ২০%-৪০%। অশিক্ষা, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার অভাব, ঘনবসতি, স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অনীহা, কুসংস্কার, বাল্য বিবাহ, অনিরাপদ যৌন অভ্যাস, নারীর প্রতি বিদ্বেষ, ইত্যাদি কারণে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে গর্ভাবস্থায় জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ার এবং মৃত্যুর হার উন্নত দেশগুলোর চেয়ে বেশি।

গর্ভাবস্থায় জন্ডিসের কারণ

১. ভাইরাল হেপাটাইটিস (হেপাটাইটিস 'এ', হেপাটাইটিস 'ই', হেপাটাইটিস 'বি' এবং হেপাটাইটিস 'সি')
২. ইনট্রাহেপাটিক কোলেসটাসিস (লিভারের অভ্যন্তরীণ প্রদাহ)
৩. অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার (লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমা)
৪. সিভিয়ার প্রি-একলাম্পশিয়া এবং একলাম্পশিয়া
৫. গল স্টোন (পিত্ত নালীর পাথর)
৬. ওষুধের অপব্যবহার
৭. ক্রনিক হেপাটাইটিস
৮. লিভার সিরোসিস

জন্ডিসের লক্ষণ

- অরুচি
- বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া
- অত্যধিক দুর্বলতা
- পেট ব্যথা
- চোখ ও প্রস্রাবের রং হলুদ হওয়া
- শরীর চুলকানো
- কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা
- পেট ও পা ফুলে যাওয়া
- রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া
- হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া বা আচরণে পরিবর্তন আসা

গর্ভাবস্থায় জন্ডিসের জটিলতা

গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে

১. হেপাটাইটিস 'ই' ভাইরাস দ্বারা গর্ভাবস্থার তৃতীয় ধাপে আক্রান্ত হলে ২০%-৩০% মায়ের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
২. অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়
৩. রোগজীবাণুর সংক্রমণ বেড়ে যায়

শিশুর ক্ষেত্রে

১. গর্ভপাত হয়
২. অপরিপক্কতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে
৩. গর্ভাবস্থায় ৫০% শিশুর মৃত্যু হতে পারে
৪. মায়ের শরীরের ভাইরাস, বিশেষ করে হেপাটাইটিস 'বি' ও হেপাটাইটিস 'সি' শিশুর শরীরে সংক্রামিত হওয়া এবং পরবর্তীতে আক্রান্ত শিশুর লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারে মৃত্যুর ভয় থাকে

রোগনির্ণয়

১. যকৃতের কার্যকারিতা পরীক্ষা

যকৃত সঠিকভাবে কার্যকর আছে কি না তা জানার

ভেতরের পাতায়: শিশুদের টনসিলের প্রদাহ এবং এডিনয়েড বৃদ্ধিজনিত সমস্যায় করণীয়

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	অধ্যাপক জন ডি ক্লেমেন্স
প্রধান সম্পাদক	ডাঃ প্রদীপ কুমার বর্ধন
উপ-প্রধান সম্পাদক	ড. রুবহানা রকিব
সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

ডাঃ মোঃ ইকবাল, ডাঃ এসএম রফিকুল ইসলাম, ড. শামসুন নাহার, ডাঃ মারুফা সুলতানা

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান মোহাম্মদ ইনামুল শাহরিয়ার

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮২৭০০১-১০
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: সৃজন প্রিন্টার্স, ঢাকা

জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো করা বাঞ্ছনীয়:

- এসজিপিটি, এসজিওটি, সিরাম বিলিরুবিন, অ্যালকালাইন ফসফেটেইস, সিরাম অ্যালবুমিন
- প্রোথ্রোম্বিন টাইম
- ভাইরাল মার্কার্স (বিশেষ করে অ্যান্টি এইচএভি, অ্যান্টিএইচইভি আইজিএম, এইচবিএসএজি, অ্যান্টিএইচসিভি)

২. কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, সিরাম ক্রিয়েটিনিন, র‍্যানডম ব্লাড সুগার, সিরাম ইউরিক এসিড, সিরাম ইলেকট্রোলাইটস, ইউরিনারি অ্যালবুমিন

৩. ব্লাড গ্রুপ

৪. পুরো পেটের আলট্রাসনোগ্রাম

৫. বিশেষ ক্ষেত্রে: এমআরসিপি এবং ইআরসিপি

চিকিৎসা

একজন গর্ভবতী মায়ের জন্ডিস ধরা পড়লেই তাঁর উচিত অবিলম্বে একজন লিভার বিশেষজ্ঞ এবং একজন গাইনোকলজিস্টের পরামর্শ ও চিকিৎসা নেওয়া। একজন লিভার বিশেষজ্ঞ প্রাথমিকভাবে সাধারণত নিম্নরূপ পরামর্শ ও চিকিৎসা দিয়ে থাকেন:

- হাসপাতালে ভর্তি হওয়া—এতে নিবিড়ভাবে মা ও শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা সহজ হয়
- পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া
- পুষ্টিকর খাবার খাওয়া
- পরিমিত পরিমাণ নিরাপদ পানি পান করা
- প্রয়োজনে শিরা পথে গ্লুকোজ স্যালাইন নেওয়া
- কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে তা দূর করতে ল্যাকটুলোজ জাতীয় সিরাপ খাওয়া
- এসিডিটি ও বমির জন্য পেনটোপ্রাজল ও অনডেনসেট্রন গ্রুপের ওষুধ খাওয়া
- ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে মুখে খাওয়ার অ্যান্টিডায়াবেটিক ওষুধের পরিবর্তে নিয়মিতভাবে ইনসুলিন নেওয়া
- চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ঘুমের ওষুধ, মানসিক রোগের ওষুধ, ব্যথার ওষুধ, চর্বি কমানোর ওষুধ, মাথা ঘুরানোর ওষুধ, ইত্যাদি না খাওয়া
- প্রয়োজনে কোনাকিয়ন ইনজেকশন, রক্ত, ফ্রেস ফ্রোজেন প্লাজমা নেওয়া
- হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত মা সন্তান প্রসবের ১২ ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে এইচবি ইম্যুনোগ্লোবিউলিন (এইচবিআইজি) এবং হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের ভ্যাকসিন দেওয়া
- নিয়মিত মা ও গর্ভের শিশুর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা

মানুষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা আছে যে জন্ডিস হলে হলুদ দিয়ে রান্না করা খাবার, মাছ, মাংস, ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়।

প্রতিকার

গর্ভাবস্থার জন্ডিস অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে, তাই এটি প্রতিরোধ করাই উত্তম। শিক্ষা ও সচেতনতাই একজন গর্ভবতী মা এবং গর্ভস্থ শিশুকে জন্ডিসের মারাত্মক ঝুঁকির হাত থেকে বাঁচাতে পারে। একজন গর্ভবতী মাকে যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে সেগুলো হলো:

- গর্ভধারণের আগে তাঁকে অবশ্যই শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিপক্ক হতে হবে। কারণ ১৮ বছর বয়সের নিচে এবং ৩৫ বছর বয়সের উপরে গর্ভধারণ নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে
- গর্ভবতী হওয়ার পর প্রত্যেক নারীরই উচিত নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা
- গর্ভাবস্থার শুরুতেই হেপাটাইটিস 'বি' এবং হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাসের পরীক্ষা করানো
- নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া
- নিরাপদ পানি পান করা ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- খাওয়ার আগে এবং মলমূত্র ত্যাগ করার পর ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া
- বাইরের খোলা খাবার এবং ফাস্ট ফুড না খাওয়া
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
- ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিহার করা
- ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা
- হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের টিকা নেওয়া
- নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত করা
- অনিরাপদ যৌন সঙ্গম না করা
- যেসব নারী আগে থেকেই হেপাটাইটিস 'বি' এবং হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত তাদের উচিত গর্ভধারণের আগে থেকেই একজন লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা
- কবিরাজী চিকিৎসা, ঝাড়-ফুক, তন্ত্র-মন্ত্র, ইত্যাদি গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা
- হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা প্রশিক্ষিত ধাত্রীর সাহায্যে জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা

জন্ডিসে আক্রান্ত মাকে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে এবং পরিবারের সদস্যদেরকেও তাঁর প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে। কারণ জন্ডিসে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের বাড়তি সেবাযত্ন প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, রোগীর চিকিৎসায় সামান্য অবহেলা বা অনিয়ম হলে দু'টি প্রাণই অকালে ঝরে যেতে পারে।

শিশুদের টনসিলের প্রদাহ এবং এডিনয়েড বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

ডাঃ রীনা দাস, আইসিডিডিআর,বি

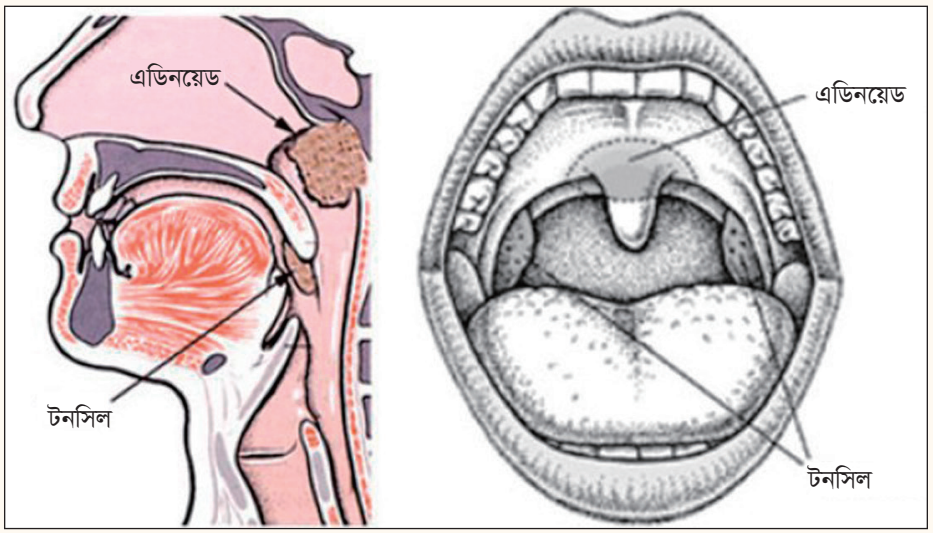

টনসিলের প্রদাহ ও এডিনয়েড বৃদ্ধি শিশুদের গলার একটি সাধারণ সমস্যা। আমাদের দেশে অনেক শিশুই এ-রোগে আক্রান্ত হয়। শীতের সময় এ-রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। টনসিল ও এডিনয়েড এক ধরনের লসিকাগ্রন্থি, যা আমাদের গলার ভিতরে শ্বাস ও খাদ্যনালীর মুখে অবস্থিত। এরা শ্বাস ও পরিপাকতন্ত্রের প্রবেশপথে প্রহরী হিসেবে কাজ করে, খাদ্য ও বায়ুবাহিত ক্ষতিকারক পদার্থ ও রোগজীবাণু ধ্বংস করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুদের ক্ষেত্রে ৪ থেকে ১০ বছর বয়সের মধ্যে টনসিল ও এডিনয়েড খুব সক্রিয় থাকে এবং এই সময়েই শিশুরা টনসিল ও এডিনয়েডের প্রদাহে বেশি আক্রান্ত হয়। এডিনয়েড সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালে ছোট হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে বিলীন হয়ে যায়। শিশুরা টনসিল ও এডিনয়েডের প্রদাহ ছাড়াও টনসিলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য নানা জটিল রোগে ভুগে থাকে। তাই টনসিল ও এডিনয়েডের অসুখে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

টনসিল কী

জিহ্বার পেছনে গলার দেওয়ালের দু'পাশে গোলাকার মাংসপিণ্ড দুটিই হচ্ছে টনসিল। হা করলে টনসিল দেখা যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে টনসিল ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত রোগ-প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে এবং বাইরে থেকে আসা মাছের কাঁটা, জীবাণু, ধুলা-বালি, ইত্যাদি আটকে ফেলে। মুখ, গলা, নাক কিংবা সাইনাস হয়ে রোগজীবাণু যখন অন্ত্রে বা পেটে ঢুকতে যায় তখন এই টনসিলই তাকে বাধা দেয়। এজন্য বাইরের কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ শ্বাসযন্ত্রেও ঢুকতে পারে না। এছাড়া, এরা শরীরে রোগ প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যেগুলো বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এভাবে এরা মানুষের শরীরকে জীবাণু ও বাইরের ক্ষতিকর পদার্থ থেকে রক্ষা করে থাকে। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরিতে টনসিলের তেমন বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না।

টনসিলের প্রদাহ

টনসিলের প্রদাহজনিত সমস্যার কারণে অনেকে গলা ব্যথায় ভোগেন। যদিও সব বয়সের মানুষেরই টনসিলজনিত সমস্যা থাকে, তথাপি শিশুদের ক্ষেত্রে টনসিলের প্রদাহ বা সংক্রমণ একটু বেশিই হয়। টনসিলের এই সংক্রমণকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় টনসিলাইটিস। সাধারণত ১০ বছরের কম বয়সী শিশুরা টনসিলের প্রদাহে বেশি আক্রান্ত হয়।

টনসিলের প্রদাহ বা ইনফেকশন বলতে আমরা কী বুঝি?

সাধারণত ভাইরাসের সংক্রমণে টনসিলের প্রদাহ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে সর্দি-কাশির জন্য দায়ী ভাইরাসগুলোই এই কাজটি করে থাকে। এছাড়া ব্যাকটেরিয়া, বিশেষ করে স্ট্রেপটোকক্কাস গোত্রের ব্যাকটেরিয়া টনসিলের প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে। যেকোনো বয়সেই টনসিলের সংক্রমণ বা টনসিলাইটিস হতে পারে। তবে শৈশবে এটি বেশি দেখা যায়।

টনসিল-সংক্রান্ত সমস্যার কারণ

- শিশুর দুর্বল স্বাস্থ্য, অপুষ্টি, এলার্জিজনিত অসুখ, ইত্যাদি
- দাঁত, নাক ও সাইনাসের প্রদাহ এবং ঠাণ্ডার প্রতি অতি সংবেদনশীলতা
- ভাইরাস ও বিভিন্ন ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ
- অনেক সময় শিশুদের মধ্যে রোগটি সংক্রামিত হয় স্কুলে থাকাকালীন সময়ে আক্রান্ত শিশুদের সংস্পর্শে এসে। তাছাড়া, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় অবহেলার জন্যেও টনসিল-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে

সাধারণত যেসব উপসর্গ দেখা দেয়

ভাইরাসজনিত টনসিলাইটিসে প্রদাহ ধীরে ধীরে বাড়ে, ফলে উপসর্গগুলোও ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়। অন্যদিকে ব্যাকটেরিয়াজনিত টনসিলাইটিস হঠাৎ করেই তীব্রভাবে আক্রমণ করে এবং গলা ব্যথা হয়। এছাড়া—

- এ-রোগ দেখা দিলে শিশুরা সাধারণত কিছু খেতে চায় না
- শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়, যা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে
- জ্বরের সঙ্গে অনেক সময় কাঁপুনি ও খিঁচুনি হয় এবং মাথা ও সারা শরীর ব্যথা করে
- গলার উপরিভাগের লসিকাগ্রন্থি ফুলে যায় ও ব্যথা করে
- সর্দি থাকে, নাক বন্ধ থাকে, মুখে দুর্গন্ধ হয়, খাওয়া-দাওয়ায় রুচি থাকে না এবং গলার উপরিভাগের লসিকাগ্রন্থি সাধারণত ফুলে থাকে
- ঢোক গেলার সময় কানে ব্যথা হয়
- টনসিলের প্রদাহের সঙ্গে কখনো কখনো পেটের অন্ত্রের ঝিল্লির লসিকাগ্রন্থির প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং এ-কারণে পেটে ব্যথা হয়

কখন দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে

- শিশুর মুখ দিয়ে ক্রমাগত লালা ঝরলে
- জ্বর ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার বেশি হলে
- খাবার বা পানীয় গিলতে অসুবিধা হলে
- গলায় ফুলে ওঠা লসিকাগ্রন্থিতে অনেক ব্যথা হলে

টনসিলের প্রদাহের চিকিৎসা

টনসিলের প্রদাহ উপসমে বিশ্রামে থাকা উচিত এবং প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়া উচিত। মুখগহ্বর যাতে সুস্থ থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এসময় সাধারণ স্যালাইন বা লবণ মিশ্রিত গরম পানি দিয়ে বারবার কুলি করা উচিত। লেবু এবং আদার সংমিশ্রণে চা পানেও টনসিলের প্রদাহ প্রশমিত হয়। গলায় যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। গলায় যেহেতু তীব্র ব্যথা এবং জ্বর থাকে, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জ্বরের ওষুধসহ কিছু ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। তবে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হতে পারে। নিয়মিত প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবনে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।

ভাইরাসের সংক্রমণের জন্য টনসিলের প্রদাহ হলে সাধারণত পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে এমনিতেই রোগী সুস্থ হয়ে যায়। তবে কখনো কখনো উপসর্গ অনুযায়ী

চিকিৎসা নেওয়ারও প্রয়োজন হয়। চিকিৎসার পর উপসর্গ চলে গেলেও টনসিলের আকৃতি ছোট হতে কিছুটা সময় লাগে এবং কয়েক মাস পর্যন্ত টনসিলের আকৃতি বড় থাকতে পারে।

কখন টনসিলের অপারেশন করতে হতে পারে

- টনসিল বড় হওয়ার ফলে ঘুমের মধ্যে শ্বাসকষ্ট হলে বা নাক ডাকলে
- দীর্ঘ দিন ঢোক গিলতে বা খেতে বেশি অসুবিধা হলে
- এক বছরের মধ্যে পাঁচ-সাতবার করে একাধারে দু'বছর কিংবা প্রতিবছর তিনবার করে পর পর তিন বছর টনসিলের সংক্রমণ হলে অপারেশনের পরামর্শ দেওয়া হয়
- টনসিলে ফোঁড়া বা পুঁজ হলে
- ছয় মাস যথাযথ চিকিৎসার পরও রোগ না সারলে

টনসিল অপারেশন নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা

অনেকেই শিশুদের টনসিল অপারেশনের কথা বললে ভয় পান। আসলে টনসিল অপারেশনে ভয়ের কিছুই নেই। অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগে,অপারেশন করে টনসিল ফেলে দিলে ভবিষ্যতে শিশুর কোনো অসুবিধা হবে কি না। এর উত্তর হলো, না, টনসিল ফেলে দিলে ভবিষ্যতে শিশুর কোনো অসুবিধা হবে না এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যাবে না। কারণ, টনসিল হলো রোগ প্রতিরোধকারী প্রথম পাহারাদার, এরপর গলায় আরো ৩০০-র বেশি লালাগ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড আছে, যেগুলো রোগ প্রতিরোধী হিসেবে কাজ করে। অনেক সমীক্ষায় দেখা গেছে, টনসিল অপারেশন করার আগে এবং পরে রোগ প্রতিরোধে কোনো তারতম্য হয় না। টনসিলের অসুবিধা দূর করার জন্য এবং ভবিষ্যতে টনসিলের সংক্রমণজনিত জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই অপারেশন প্রয়োজন। কাজেই, টনসিল ফেলে দেওয়ার ফলে ভবিষ্যতে সাধারণত কোনো ধরনের সমস্যা হয় না।

চিকিৎসা না করলে টনসিলের প্রদাহ থেকে যেসব জটিলতা হতে পারে

- পেরিটনসিলার অ্যাবসেস বা টনসিলে পুঁজ জমা
- বারবার টনসিলের ইনফেকশনের কারণে ঊর্ধ্ব শ্বাসনালী, সাইনাস, মধ্যকর্ণ, ইত্যাদিতে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- টনসিল খুব বড় হলে সেক্ষেত্রে শিশুর খাবার গ্রহণ ও শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় এবং শিশু নাক ডাকে
- রিউমেটিক ফিভার বা বাতজ্বরের কারণ হিসেবেও অনেক সময় বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস নামের ব্যাকটেরিয়াজনিত টনসিলের সংক্রমণকে দায়ী করা হয়
- হৃদরোগ ও দীর্ঘস্থায়ী কিডনির রোগ

টনসিলের প্রদাহজনিত জটিলতা প্রতিরোধের উপায়

সাধারণভাবে টনসিলাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে রোগী এমনিতেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। তারপরও কিছু সতর্কতা, বিশেষ করে খাদ্যাভাসের কিছুটা পরিবর্তন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এই অবস্থায় শরীরে প্রকটভাবে পানিশূন্যতা দেখা দেয়। সেজন্য প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা উচিত। লেবু ও আদার সংমিশ্রণে হালকা গরম চা বা মধুর সংমিশ্রণে কুসুম গরম পানি পান করা যেতে পারে। তবে কোনো ঠাণ্ডা কোমল পানীয় বা আইসক্রীম না খাওয়াই ভালো। এসব গলার ইনফেকশনের জন্য উত্তেজক হিসেবে কাজ করে। খাবারের ক্ষেত্রেও একটু সাবধানী হওয়া ভালো, শক্ত খাবারের পরিবর্তে নরম ভাত, স্যুপ, ইত্যাদি খাওয়াই শ্রেয়।

এছাড়া, এক কাপ কুসুম গরম পানির সাথে ১/৪ চা চামচ লবণ মিশিয়ে গার্গল বা গড়গড়া করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। দিনে কমপক্ষে ৩/৪ বার গার্গল করা উচিত। এসময় টানা বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন এবং গলায় যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত।

এডিনয়েড বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

এডিনয়েড এক ধরনের গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড যা নাক ও গলার সংযোগস্থলে তালুর ঠিক উপরে থাকে। বাইরে থেকে এডিনয়েড দেখা যায় না। এডিনয়েড বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সাধারণত শিশুদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। এডিনয়েড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়:

- মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া, মুখ হা করে ঘুমানো
- দাঁতের অস্বাভাবিক গড়ন
- লম্বাটে মুখমণ্ডল ও চ্যাপ্টা বুক
- শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিবন্ধকতার কারণে শিশুদের স্বাভাবিক ঘুম না হওয়া, ঘুমের মধ্যে ছটফট এবং এপাশ-ওপাশ করতে থাকা
- খেলাধুলায় উৎসাহ না থাকা
- খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি থাকা, কম খাওয়া এবং খেতে খেতে অনেক সময় বমি করে দেওয়া
- রাতে প্রায়ই কাশি থাকা
- সব সময় শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন প্রদাহে ভোগা
- আচার-আচরণে অনেক সময় অতি মাত্রায় ব্যতিব্যস্ত হওয়া, বিরক্ত ভাব বা মনমরা ধরনের হয়ে থাকা
- সকালের দিকে মাথা ব্যথা থাকা এবং দিনের বেলায় অলসতা দেখা দেওয়া
- রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিবন্ধকতা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে পালমোনারি হাইপারটেনশনসহ হৃদযন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে এবং এমনকি হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ঘুমের মধ্যে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে

এডিনয়েডের সমস্যা হলে করণীয়

একটি শিশুকে বার বার ডাকা সত্ত্বেও ডাকে সাড়া না দিলে অথবা রাতে হা করে শ্বাস নিলে, শ্বাস নেওয়ার সময় মুখ দিয়ে লালা পড়লে, রাতে শোয়ার সময় কটমট শব্দ করলে, উল্টাপাল্টা কথা বললে, বা বার বার ঘুম ভেঙে গেলে মা-বাবা বা অভিভাবকের উচিত অতিসত্ত্বর একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া। এছাড়া, শিশু যদি স্কুলে যেতে অনিহা প্রকাশ করে এবং তার ফলে আস্তে আস্তে ফলাফল খারাপ হয়ে যায়, তাকে যদি রেডিও বা টেলিভিশনের আওয়াজ বাড়িয়ে দিতে দেখা যায়, তখনই বুঝতে হবে তার টনসিল ও এডিনয়েডের সমস্যা থাকতে পারে। এই অবস্থায় দেরি না করে শিশুকে নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং ভালোমত পরীক্ষা করাতে হবে। এটি প্রথম থেকে ধরা পড়লে বড় ধরনের জটিলতা এড়ানো সম্ভব।

এডিনয়েডের চিকিৎসা

এক্ষেত্রে সাধারণত মুখের তালুর একটি এক্স-রে করা হয়। এটি করলেই বোঝা যায় এডিনয়েড আকারে বেড়েছে কি না। এসব ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক, নাকের ড্রপ, অ্যান্টিহিসটামিনজাতীয় ওষুধ প্রয়োগে ৫০% ক্ষেত্রেই রোগীর ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওষুধে যদি ভালো না হয়, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যত দ্রুত সম্ভব এডিনয়েড অপারেশন করে ফেলে দেওয়া উত্তম। এডিনয়েড অপারেশনের সময় যদি দেখা যায় টনসিলও অনেক বড়, তখন একসঙ্গে টনসিলও অপারেশন করে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তা না হলে টনসিলও শিশুকে এডিনয়েড বৃদ্ধিজনিত ওইসব সমস্যায় ভোগাতে পারে। তাই অপারেশন করে একসঙ্গে এডিনয়েড ও টনসিল দুটোই ফেলে দেওয়া উত্তম।

শিশুর টনসিলের প্রদাহ এবং এডিনয়েডের সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রয়োজনে অপারেশন করে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঠিক রাখুন। সঠিক চিকিৎসা এবং কিছু নিয়ম মেনে চললে খুব সহজেই টনসিলের প্রদাহজনিত সমস্যা ও এডিনয়েড বৃদ্ধি-সংক্রান্ত জটিলতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান

যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।

ISSN 1021-2078